কে উনি?

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর

কে উনি?

রিসিভারটা কানে তুলতেই ওপাশ থেকে বিরক্তিকর একটা টানা কণ্ঠ ভেসে এলো,

—হ্যালো, রমনা থানা?

এই কথাটা, ঠিক এই সুরেই হুবহু কোথায় যেন আগে শুনেছেন। কিন্তু এখন একটুও মনে পড়ছে না অসম্ভব মেধাবী আর শ্রুতিধর পুলিশ অফিসারের। ভ্রু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করতে করতেই গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন,

—ইয়েস।

—ওসি সাহেব আছেন?

—জি, আছেন। আমি রমনা থানার ওসি বলছি। বলুন?

—ও, বলছেন? আমাদের বাসার সামনের রাস্তায় সম্ভবত একটা খুন হয়েছে। একটু আসবেন প্লিজ?

শুক্রবারের ডিউটি করতে ইচ্ছে করে না কেন যেন। ছোটবেলার শুক্রবার-শুক্রবার গন্ধটা এত বছরের চাকরির পরেও মাথা থেকে তাড়ানো গেল না। পাশের নোটবুকে ঠিকানা টুকে নিতে নিতেই চোখের ইশারা করলেন ওসি সাহেব। এই ইশারার অর্থ থানার সবাই জানে। ফোর্স রেডি করতে হবে। ঘটনাস্থলে যেতে হবে।

☆☆☆

লাশের সামনে দাঁড়িয়ে এখনো সেই একই ভঙ্গিতে ভ্রু কুঁচকানো ওসি সাহেবের। পুলিশের চাকরি নেয়ার পর থেকে অনেক লাশ দেখেছেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত

রহস্যময় দৃশ্য এই প্রথম। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে লাশটাকে আরেকবার দেখলেন তিনি।

লাশের গায়ে ধবধবে উজ্জ্বল সাদা জামা। বুকের কাছটা রক্তে ভিজে জবজবে লাল হয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, এলাকার পলিটিক্যাল চাঁদাবাজদের মহান কীর্তি! মৃতদেহের খোলা দৃষ্টি আকাশের দিকে। স্থির। শান্ত। আনন্দিত সেই দৃষ্টি আকাশের সীমানা পেরিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আনন্দিত মনে হওয়ার দুটো কারণ। প্রথম কারণটা হচ্ছে ঠোঁটে লেগে থাকা মুচকি হাসির একটা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আভা। দ্বিতীয় কারণ, চোখ। ভেতরের খুশি মুখের অভিব্যক্তিতে লুকানো থাকলেও চোখে ঠিকই ভেসে ওঠে। আর ঠিক এই কারণেই লাশটাকে অদ্ভুত মায়ায় মাখানো আর রহস্যময় মনে হচ্ছে। এরকম হাসিখুশি মৃতদেহ জীবনে প্রথমবারের মতো দেখে কেন যেন শান্ত আর স্বাভাবিক লাগছে ভেতরটা। এমন স্থিরতা আর প্রশান্তির অনুভূতিও এই প্রথম।

হাতে জ্বলতে থাকা সিগারেটের ছাই ঝাড়তে গিয়ে একটা রিংটোন কানে এলো। উৎস খুঁজতেই পাওয়া গেল লাশের হাতে থাকা ফোনটা। কল করছে কেউ একজন। খুব সন্তর্পণে কাছে গিয়ে সুখীমুখী রহস্যময় লাশের মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নামটা পড়ার চেষ্টা করলেন ওসি সাহেব। নামটা পড়তেই মনে পড়ল থানায় আসা ফোন কলটার কথাগুলো।

ইয়েস, এখন সব মনে পড়েছে। ফোনের প্রথম দিকের কথাগুলো আগে কোথায় হুবহু শুনেছেন মনে পড়ে গেছে। ছোটবেলায় বিটিভিতে দেখা একটা নাটকে। বিখ্যাত নাটক। হুমায়ূন আহমেদের। নাটকটার ফোনকলের কথাগুলো মনে পড়ছে। অসাধারণ মজার নাটক ছিল। আহা! কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই?

লজ্জায় আর রাগে হ্যান্ডসাম ওসি সাহেবের ফর্সা দু-গালে একটু লালিমা ভেসে উঠল। একটা মার্ডার সিনে এসে মাথার ভেতরে হুমায়ূন আহমেদের নাটক আর মান্না দের গানের কলি ভেসে ওঠাটা নির্ঘাত লজ্জার বিষয়। শুধু লজ্জা নয়, বরং বিরাট অপরাধের। নিজের ওপরে ভালোই রাগ উঠে যাচ্ছে। ওসি সাহেব এক ঝটকায় মাথাটা পরিষ্কার করলেন। রহস্যমুখী লাশের হাতের পাশে পড়ে থাকা ফোনটায় রিং বেজেই যাচ্ছে।

ওসি সাহেব ত্বরিতগতিতে কয়েকটা হিসেব কষে নিলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, কলটা রিসিভ করবেন।

[দুই]

একটানে নিজেকে বিছানা থেকে তুলে চেয়ারে ছুড়ে দিলো হৃদয়। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নোটবুক আর পেন্সিল টেনে নিল দ্রুত অথচ অভ্যস্ত হাতে। কাগজের সাদা পাতায় মনের চিন্তা আর কথোপকথনের ঝড়টাকে খসখস শব্দে বেঁধে ফেলতে হবে এখন একমনে। কাজটা হৃদয়ের খুব পছন্দের হলেও সহজ নয় কিন্তু। মাথার ভেতরের বিতর্কযুদ্ধটা আবার শুরু হয়ে গেছে। সারাদিন কিছু না ঘটলেও ঘুমুতে এলেই মনের ভেতরের দুটো কণ্ঠ জেগে ওঠে ঠিক ঠিক। একজন প্রশ্ন করতে থাকে, আরেকজন উত্তর দেয়। আবার কখনো উত্তরদাতা প্রশ্নের গুগলি ছুড়ে দেয়, প্রশ্নকর্তা উত্তরের ব্যাটে বল হাঁকায়। এভাবেই পড়াশোনা আর জানার পাশাপাশি চিন্তাযুদ্ধ চলছে তিন বছর ধরে।

তবে গত পাঁচ দিনের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। অবশেষে হৃদয় নিজেই প্রশ্নোত্তরের যুদ্ধটাকে উপভোগ করতে শুরু করেছে। এটাকে আরো জমিয়ে তুলতে সে করছে কি, যুদ্ধ শুরু হলেই নিজের হাতে যত্নে বাঁধাই করা নোটবুকে 2B পেন্সিলে চিন্তাগুলোকে লাইনে লাইনে সাজিয়ে নোট করে ফেলছে। তো, এই হচ্ছে হৃদয়ের মাথার ভেতরে চলতে থাকা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পটভূমি। এর চাইতে বেশি ভূমিকা দিতে গেলে হৃদয় কুমারের আজকের কথোপকথনটা আর লিখে রাখা হবে না।

—প্রাচ্যের-পশ্চিমের ইতিহাসবিদরা যেহেতু সাক্ষী দিচ্ছেন আর মুসলিম স্কলারদের রেকর্ড করে রাখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লেখা বায়োগ্রাফিগুলো সেই ইতিহাসকে আরো মজবুত ভিত্তি দিচ্ছে, সেহেতু পরিষ্কারভাবেই বুঝতে এবং মানতে বাধ্য হচ্ছি, মুহাম্মাদ নামে একজন এসেছিলেন যার জীবনের কাজ, ঘটনা আর কথামালাকে অদ্ভুত কিন্তু কার্যকরী এক উপায়ে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে। খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ নিয়ে রচিত বইপত্র আর রিসার্চ আর্টিকেলগুলো নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করার পর এটাও মানতে বাধ্য হচ্ছি, তার ব্যাপারে রেকর্ড করে রাখা ঘটনাবলি নিয়ে ইতিহাসবেত্তা এবং মেধাবী স্কলারদের করা ক্লাসিফিকেশানগুলো আসলেই অসাধারণ এবং তুলনাহীন। ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষকরা শত্রুপক্ষ হয়েও যেখানে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি মেনে নথিবদ্ধ করা পরিচ্ছন্ন এই ইতিহাস আর বায়োগ্রাফিগুলো দেখে অবাক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, সেখানে আমি না মানার

কে? কিন্তু তবুও আমার একটা প্রশ্ন আছে।[১][২]

—কী সেটা?

—প্রশ্নটাকে সহজ করে এক কথায় এইভাবে বলতে হয়, কে এই মুহাম্মাদ? আর ভেঙে ভেঙে যদি বলি তাহলে জিজ্ঞেস করতে হয়, সত্যিই কি তার দাবি অনুযায়ী তিনি একজন নবি ছিলেন? একমাত্র স্রষ্টার নির্বাচিত বার্তাবাহক ছিলেন? কীভাবে এই দেড় হাজার বছর পরেও আমি নির্দ্বিধায় বুঝে নিতে পারব যে, তিনি মিথ্যে বলেননি? অথবা মস্তিষ্কের কোনো সমস্যার কারণে তিনি নিজেই বিভ্রান্ত ছিলেন না?

—তোমার প্রশ্ন করার ক্ষমতা সত্যিই প্রশংসনীয়। একেবারে মূল তিনটি প্রশ্নই তুমি করে ফেলেছ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর পেলেই উনার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে চলে আসা যায় চোখ বুজে। উত্তরটা আমার কাছে তৈরি আছে, কিন্তু সেই উত্তর বুঝে মেনে নিয়ে সত্যকে মাথা পেতে নিতে তুমি তৈরি কি না, সেটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন।

—তৈরি থাকব না কেন? স্রষ্টার অস্তিত্বের সত্যতা আর একত্বের অকাট্যতা বুঝে ফেলার পর আমি কি যাবতীয় বস্তুপূজা তথা সৃষ্টিপূজা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে শুধু সেই এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে সঁপে দিইনি?

—দিয়েছ। ধাপটা কঠিন ছিল নিঃসন্দেহে। তবে এই ধাপটা আরো কঠিন। তোমার এই নিজেকে এক স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে সঁপে দেয়ার ব্যাপারটা সমাজ জানে না, জানলেও পরোয়া করে না, কারণ সমাজের নানা ধর্মের লোকেদের মাঝে এই স্রষ্টার ধারণাটা নতুন কিংবা অভিনব নয়। যেহেতু স্রষ্টার ধারণাটা তোমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর মহল্লাবাসীর সবার কাছেই প্রচলিত, অর্থাৎ সর্বজনীন, সেহেতু তুমি কোনো ঝামেলা পোহাচ্ছ না। কিন্তু যখনই মুহাম্মাদের সত্যি সত্যি বার্তাবাহক হবার ব্যাপারটা তুমি বুঝে-সুঝে মেনে নেবে তখনই কিন্তু খবর আছে! আর সেজন্যই জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে, সত্যকে জানার পর, বুঝে ফেলার পর সেই পবিত্র সত্যকে নিজের জীবনে-মননে মাথা পেতে নিতে তুমি আসলেই প্রস্তুত কি না?

---

[১] মাওলানা আব্দুর রহীম রাহিমাহুল্লাহর *হাদিস সংকলনের ইতিহাস* গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

[২] *Studies in Hadith Methodology and Literature,* Mustafa al Azami.

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। এত ভয় দেখাচ্ছ কেন বলো তো? কেন বলছ যে, মুহাম্মাদের ব্যাপারে প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে বুঝেশুনে উনার ব্যাপারে সত্যকে জীবনে মেনে নিলে 'খবর' আছে?

—কারণ, উনার ব্যাপারে সত্যকে মেনে নেয়ার পর তুমি আর দশজনের মতো নিজের পশুত্ব আর বস্তুবাদী সত্তার খাঁচায় আটকে থাকবে না। মিথ্যে আমিত্বের খোলস ভেঙে জন্ম নেবে এক নতুন আমি। এই সত্য হচ্ছে পরশ পাথরের মতো। পাথরও এর পরশে স্বর্ণে বদলে যায়। আর তুমি তো পাথর নও, মানুষ! বস্তুবাদী পশুত্বের খোলস ছিঁড়ে ভেঙে তুমি তখন উনাকে ভালোবেসে ফেলবে, হয়ে উঠতে চাইবে উনার মতো অসাধারণ একজন, সত্যিকারের পরিপূর্ণ একজন মানুষ হয়ে উঠতে চাইবে, নিজেকে দেখতে চাইবে, নিজের সত্তাকে বুঝে চিনে নিতে চাইবে, নিজের আপাত-সীমানাকে নিজেই অতিক্রম করে নিজের সত্যিকারের সীমানাটা ছুঁয়ে দিতে চাইবে প্রাণপণে, তখনই সবার সাথে শুরু হয়ে যাবে কঠিন সংঘর্ষ।

সবাই যেখানে নিজের ইচ্ছের পূজো করে, নিজের বস্তুসত্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পূজার মোহে ডুবে থেকে তৃপ্তি খোঁজে, তখন তুমি এই বস্তুর সার-সত্য বুঝে নিজের আত্মিক শক্তিকে উন্নত আর পবিত্র করে নিতে চাইবে ঠিক পথে। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছের পূজোকে পায়ে দলে পিষে সব রকম ইচ্ছে আর চাওয়াকে সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে একমাত্র স্রষ্টার সঠিক ইচ্ছে জেনে নিতে চাইবে এই মুহাম্মাদের দেখানো পথ ধরেই। ব্যাপারটা ইন্দ্রিয় আর বস্তুপূজারীদের প্রতিটা পদক্ষেপের উল্টো হবে।

সবচাইতে বড় ইন্দ্রিয় আর বস্তুপূজারী অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে আক্রমণ করবে তার সব রকম পৈশাচিক বাহিনী নিয়ে, যে বাহিনীতে মানব-দানব দুই-ই আছে। পৌরাণিক কাহিনির কুরুক্ষেত্রের কঠিন যুদ্ধে বর্ণিত অর্জুন-কৃষ্ণের মিলিত সাধনার চাইতেও কঠোর সাধনা তোমায় করতে হবে যদি জয়ী হতে চাও। আত্মীয়রূপী দুরাত্মা দুর্যোধন, শকুনী আর কংসমামা, ভীম আর দ্রোণাচার্য কিংবা কর্ণের মতো কঠিন বিপর্যয়কেও মোকাবেলা করে তোমাকে হারাতে হবে। বড় কঠিন এ পথ। শুধু মুখের কথায় নয়, ঘামে-রক্তে-ত্যাগে এই পবিত্র সাধনার পথ ভিজে জবজবে হয়ে যাবে। কাউকে দেখাতে নয়, নিজের পথে, নিজের অর্জনকে নিজেই পরখ করে দেখে নিতে হবে সত্যের কষ্টিপাথরে বারবার।

এই পথ নির্ভুল। পথ হিসেবে সবচাইতে সহজ। অথচ এই সহজতম পথটাকেই এত বছরের বস্তু আর ইন্দ্রিয়পূজার মাধ্যমে তুমি কীভাবে কঠিনতম বানিয়ে বসে আছ,

সেটাই তুমি টের পাবে পদে পদে। নিজের তৈরি কাঁটায় নিজেরই পা ফালা ফালা হয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। হাঁটতে পারবে না। অসহ্য ব্যথায় কুঁকড়ে অবশ হয়ে কতবার অসহায় হয়ে এই পথের ধারে নিশ্চল হয়ে পড়ে রবে। এই পথে তুমি হয়ে যাবে একা। সবচেয়ে একা। তবুও চোখের পানি মুছে, পায়ের ক্ষত, গায়ের ব্যথা ভুলে একা একাই হাঁটতে হবে। হাঁটতে হাঁটতেই একসময় আবিষ্কার করবে এই পথে আসলে তুমি কখনোই একা ছিলে না। একাকিত্বের এই ব্যাপারটা শুধুই ছিল অজ্ঞতাপ্রসূত, ইন্দ্রিয়ের দেখা। অন্তর্যামী যখন তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে খুলে দেবেন, সত্যকে দেখিয়ে দেবেন, তখনই বুঝবে...

—কী বুঝব?

—সত্যি বলতে কী, এটা শব্দে, কথায়, চিন্তায় কিংবা কোনোরকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। হাঁটতে হাঁটতেই বুঝতে পারবে। এভাবেই বুঝতে হয়।

—কিন্তু আমি আর তুমি তো এক। আমি যেটা জানি না, বুঝি না, সেটা ইতোমধ্যেই তুমি যেন জেনে বসে আছো!

—তুমিও জানো। সবার মতোই যে এই লেখাটা পড়ছে সেও জানে। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালে পেঁচিয়ে হারিয়ে সে কেবল এই জানার ব্যাপারটাই অনুভব করতে পারছে না। ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি আর মায়ার ইন্দ্রজাল থেকে বেরুতেই তাই এই এক জীবন মরণপণ সাধনা। সত্যকে জানতে চাওয়া, জানার পর মেনে নেয়া। মেনে নিয়ে আরও জেনে হাঁটতে থাকা। গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সহস্র আঘাত বাধা পেয়েও থেমে না যাওয়ার এই পথ তো সহজ নয়। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, সাহস আছে তো? তুমি প্রস্তুত তো?

—হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। সত্য যত তেতোই হোক না কেন, যতই আমার অভিজ্ঞতা আর জ্ঞানের অপর্যাপ্ততায় কঠিন মনে হোক না কেন, সেই তিক্ততা আর কাঠিন্যকে অতিক্রম করে আমি এই সত্যকে বুঝে নিতে চাই, বোঝার পর মেনে নিতে চাই। বুঝলাম এই পথ কঠিন, ঘর্মাক্ত রক্তাক্ত কঠিন, তবু বলে রাখি, আমি এই কঠিনেরেই ভালোবাসিলাম।

—আহ! আর কী চাই! তাহলে শুরু করা যাক।

[তিন]

তোমার প্রশ্নগুলোকে গুছিয়ে লেখা যাক। মুহাম্মাদকে নিয়ে তোমার উত্থাপিত সবগুলো প্রশ্নের সারাংশ হচ্ছে এরকম—

» তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন

» অথবা মানসিকভাবে বিভ্রান্ত ছিলেন।

» তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং একই সাথে মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত ছিলেন।

» অন্যথায় তিনি সঠিক ছিলেন।

অর্থাৎ তুমি যদি প্রমাণ পেয়ে যাও যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না, মানসিকভাবে বিভ্রান্তও ছিলেন না, তাহলেই কিন্তু প্রমাণিত হয়ে যায়, ফলে মেনে নিতে হয় যে, তিনি যা বলেছেন বুঝেশুনে নিষ্ঠার সাথে সত্য বলেছেন। এতে কোনো মিথ্যা নেই, ভ্রান্তি নেই, সংশয় নেই। ভাবলে বুঝতে পারবে, উনার ব্যাপারে তোমার যত প্রশ্ন, দ্বিধা আছে সবগুলোই তিনি মিথ্যাবাদী হওয়া অথবা মানসিকভাবে সুস্থ না থাকার অধীনে চলে আসে। কাজেই এইটুকু পরিষ্কার হওয়াই যথেষ্ট যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন কি না, মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন কি না অথবা একসাথে দুটোই ছিলেন কি না। ঠিক?

—হুম! জটিল ব্যাপার। একটু দাঁড়াও। ভাবতে হবে। ...ওয়েইট ওয়েইট, তুমি তো ঠিকই বলেছ! যে প্রশ্নই করছি উনার বিরুদ্ধে, যেটাই মনে আসছে সেটাই দেখছি এই দুটো কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাইছে। হয় বলছে তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন, আর না-হয় বলতে চাইছে তিনি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলেন না। উফফফ, ভাবতেই শান্তি লাগছে এখন। আমি তো টেনশানেই পড়ে গিয়েছিলাম, এত হাজার হাজার প্রশ্ন উনার বিরুদ্ধে, কোনটা দিয়ে আগে শুরু করব! আর শুরু করলেও কয় বছর লাগবে এতগুলো প্রশ্নের উত্তর শেষ হতে! এত বিশাল সব সমস্যাকে যে এইভাবে দেড় লাইনে বেঁধে ফেলা যাবে সেটা কখনো কল্পনাই করিনি।

—ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম! বাই দ্য ওয়ে, এই কৃতিত্ব কিন্তু আমার না। এতদিন যে বইগুলো পড়েছ আর বিভিন্ন লেকচার শুনেছ, সেমিনারে গিয়েছ, নাস্তিক আর মুসলিমদের সাথে আলোচনা করেছ, কথাগুলো কিন্তু সব ওখানেই ছিল। এতদিন

হয়তো খেয়াল করোনি, আজ তাই একটু ভাবতে বসেই অবাক হয়ে যাচ্ছ।

—হবে হয়তো। আচ্ছা, এ নিয়ে এত ভ্যাজর ভ্যাজর না করে চলো মূল কথায় চলে যাই।

—যাচ্ছি। দাঁড়াও। একটু ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার।

ওয়াশরুম থেকে বের হওয়ার সময় হৃদয় ভাবছিল ভাইয়ার সাথে আজ যোগাযোগ করবে কি না। ভাইয়া এমনিতে ওর সব কথা জানে। সবই শেয়ার করে সে ভাইয়ার সাথে। কিন্তু এই কথাগুলো এখনো বলা হয়নি। মুহূর্তেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে, কথাগুলো ভাইয়াকে পাঠাবে। ভাবতে ভাবতেই আবার চিন্তাগুলোকে শব্দবন্দি করতে লাগল হৃদয়।

—তো, যা বলছিলাম। উনার জীবনের সংরক্ষিত ঘটনাবলি থেকে যাচাই করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জেনে নিতে হবে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন নাকি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন? নাকি দুটোই ছিলেন একসাথে? অন্যথায় বোঝা যাবে, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ একজন সত্যবাদী মানুষ। ঠিক?

—একদম।

—তাহলে প্রথমেই দেখা যাক তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন কি না। এটা বোঝার জন্য চলে যেতে হবে উনার সময়কার মানুষদের কাছে। জেনে নিতে হবে উনার সমসাময়িক মানুষজন উনাকে কেমন মানুষ হিসেবে জানত চিনত।

—সমসাময়িক মানুষ বলতে কি উনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর পাড়া-প্রতিবেশীর কথা বলছ?

—ঠিক তাই। জানো, ওরা উনাকে ডাকত 'আল-আমিন' বলে? শব্দটা অ্যারাবিক। ইংরেজিতে The Trustworthy। বাংলায় বিশ্বস্ত, সৎ এবং আমানতদার। খেয়াল করো, আমি ইংলিশে কিন্তু The দিয়ে বলেছি, শুধু Trustworthy বলিনি। অর্থাৎ যেকোনো বিশ্বস্ত, আমানতদার বা Trustworthy নয়, বরং এমন নির্দিষ্ট একজন বিশ্বস্ত মানুষ যার মাঝে আমানতদারিতা পূর্ণতা পেয়েছে। কেমন পূর্ণতা? এ পূর্ণতা এমনই যে, এখানে 'আমিন' শব্দের আগে 'আল' বসিয়ে মানুষটার সাথে এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, 'আল-আমিন' বললে কেবল এবং কেবলই

আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই সবাই চোখ বুজে বুঝে নেবে, অন্য কাউকে নয়। এই সুযোগে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি জানো ওই সময়ের আরবদের ভাষার দক্ষতা কেমন ছিল?

—আরবি ভাষার ওপর? অবশ্যই তুলনাহীন। তৎকালীন আরবদের মাঝে সবচাইতে গর্বের বিষয়গুলোর একটা ছিল আরবি ভাষা আর কাব্যে গভীর দখল। ব্যাপারটা নিয়ে ওরা এত্ত সিরিয়াস ছিল যে তাদের মাঝে ভাষায় যারা শ্রেষ্ঠ তারা মুখে মুখে অসাধারণ সব কবিতা বানিয়ে ফেলত। কথায় কথায় ছন্দমাত্রা ঠিক রেখে কবিতা বানাতে পারা যে কী পরিমাণ কঠিন মেধা আর পরিশ্রমের কাজ তা ভাষা নিয়ে যারা কাজ করেনি তাদের পক্ষে বুঝে নেয়াটাও মুশকিল। শুধু ছন্দমাত্রা ঠিক রেখে কবিতা বানালেই হবে না, কবিতার মাঝে শব্দের ব্যবহার কতটা যথাযথ, নির্ভুল এবং যৌক্তিক সেটাও তারা নিখুঁত বিশ্লেষণ করত, আলোচনা-সমালোচনা করত।

বলে রাখা দরকার, কাবা কিন্তু তখনো সবচাইতে সম্মানিত স্থান ছিল আরবদের কাছে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে তখনো মানুষ ছুটে আসত কাবার প্রাঙ্গণে। শুধু কাবা নয়, কাবার দেখাশোনাকারীরাও ছিল সবার কাছে সম্মানিত। সেই সম্মানিত কাবার গায়ে তারা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ আর অসাধারণ কবিতাগুলোকে প্রদর্শনীর জন্য ঝুলিয়ে রাখত। এই কবিতাগুলো দেখতে পেত দুনিয়ার একেক প্রান্ত থেকে ছুটে আসা মানুষগুলো। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একজন কবির জন্য, এবং সেই কবির গোত্রের জন্য অসম্ভব সম্মানের ব্যাপার। এত বেশি সম্মানের যে, এরকম একজন কবি হিসেবে যদি কেউ স্বীকৃতি পেত, তাহলে তার পুরো গোত্র তার সম্মানে ভোজ আর আনন্দ উৎসবের আয়োজন করত। একটা গোত্রের মাঝে এরকম একজন কবির উত্থান অনেকটা আজকের যুগে নোবেল জয় করার মতো একটা বিষয় ছিল বলা যায়।

আরবি ভাষায় এই সুনিপুণ দক্ষতা আর পাণ্ডিত্যের শিখরে পৌঁছানোর জন্য তারা যে কী পরিমাণ গুরুত্ব দিত আর পরিশ্রম করত সেটা বোঝানোর জন্য আরেকটা উদাহরণ না দিলেই নয়। মক্কা নগরী একটা মরুভূমি অঞ্চল হওয়ায় এখানকার লোকেরা মূলত ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল ছিল। বছরের দুটো সময়ে, শীতে আর গ্রীষ্মে মক্কা নগরীর কুরাইশরা বাণিজ্যের জন্য সিরিয়া আর আবিসিনিয়ায় যেত। এই ব্যবসার ওপরেই নির্ভর করত তাদের সমগ্র অর্থনীতি।

তো ব্যবসার জন্য এই যে বছরে দুইবার বিদেশ যাওয়া, বিদেশি মানুষদের সাথে বেচাকেনার জন্য কথাবার্তা বলা, এর প্রভাব যে দৈনন্দিন জীবনের কথ্য আরবিতে

গিয়ে পড়বে সে তো বলাই বাহুল্য। ভাষার দক্ষতা আর ব্যবহারের গভীরতা নিয়ে অসম্ভব সিরিয়াস কুরাইশরা তাদের ব্যবহৃত আরবির ওপরে এই প্রভাব চুপচাপ দেখবে, কিছু করবে না, এতটা উদাসীন হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভব না! তাই যে কটা কারণে তারা তাদের সদ্য জন্ম নেয়া শিশু সন্তানকে গ্রামের বেদুইনদের কাছে লালন-পালনের জন্য পাঠিয়ে দিত, তার মাঝে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভাষার বিশুদ্ধতার লালন আর সঠিক পরিচর্যা।

গ্রাম্য বেদুইনরা যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিদেশ যেত না, তাই স্বাভাবিকভাবেই অ্যারাবিকের প্রতি সংরক্ষণশীলতা এবং অতি যত্ন তাদের ভাষাকে আরো শানিত ও পরিশীলিত করত, নির্মল ও বিশুদ্ধ রাখত। এই পরিচর্যার কারণে আরবি ভাষা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব সমৃদ্ধ, গম্ভীর এবং একই সাথে প্রবহমান। এই সমৃদ্ধ ভাষাচর্চার পরিবেশে যে শিশু বেড়ে উঠবে, কথা শিখবে, তার ভাষা যে নির্মল, সুন্দর আর বাঙ্ময় হবে তা নিশ্চয়ই আর বলার অপেক্ষা রাখে না! ফলে গোত্রে-গোত্রে, পরিবারে-পরিবারে গড়ে উঠতে লাগল অ্যারাবিকের একেকজন গুরু। এই ভাষাবিদ পণ্ডিত সব দক্ষ আর খুঁতখুঁতে কবিদের মুখ দিয়েই যে মুহাম্মাদের জন্য 'আল-আমিন' বিশেষণটা বেরিয়ে এসেছিল ও পুরো মক্কাবাসী সেই অনন্য বিশেষণকে একবাক্যে মেনে নিয়ে উনাকে এই চরম সম্মানিত বিশেষণে ভূষিত করেছিল, ইতিহাসের এই দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য আমার কাছে এত্ত বেশি অবাস্তব লাগে যে, বিস্ময়ে হা হয়ে যাই মাঝে মাঝে।

—কেন? অবাস্তব মনে হয় কেন?

—হবে না কেন? আমাদের এলাকার কাউকে যদি আমরা সবাই মিলে এরকম একটা বিশেষণ দিই, সেটা কখন দিব? কেমন মানুষকে দিব? গভীরভাবে ভাবো। আর এলাকার ভালো-খারাপ সব মানুষ যদি সেই বিশেষণকে একবাক্যে বিনা তর্কে মেনে নেয়, তার ওপরে তাকে সেই বিশেষণে ভালোবেসে ডাকতেও শুরু করে, এটা সেই বিশেষণকে, সেই যথার্থতাকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যায় বুঝতে পারছ? আমার এলাকার কাউকে নিয়ে এমন ভাবনা আমার কাছে এতটাই অসম্ভব মনে হচ্ছে যে, ব্যাপারটা কল্পনায়ও আনতে পারছি না।

তো, এক্ষেত্রে আমার কাছে একজন মানুষের এমন জীবনের সবচাইতে বড় সাফল্য আবার একই সাথে চরম অবাস্তব আর বিস্ময়কর মনে হবে না, বলো? আবার

অবাস্তবও বলি কী করে? কারণ ইতিহাস এই তথ্যের ব্যাপারে এত শক্তভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এটা ধ্রুবসত্যের মতো এই হাজার বছরকে হারিয়ে দিয়ে আজও জ্বলজ্বল করছে।

—তাহলে তো তুমি বুঝেই ফেললে, এই মানুষটার আমানতদারিতা, বিশ্বস্ততা আর সততা কোন পর্যায়ের ছিল। উনার সততা নিয়ে তোমার মধ্যে তো অন্তত আর কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

—কিন্তু আছে যে!

—ওমা! কেন?

—দেখো, চল্লিশ বছর বয়সে উনি এক বিশাল অলৌকিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ইতিহাস এ বিষয়টাকে এভাবেই বলছে। সেই অভিজ্ঞতায় ওলট-পালট হয়ে যান মানুষটা। এতক্ষণ তো আমরা উনার চরমতম সততা আর অনন্য সব গুণের স্বীকৃতিস্বরূপ নগরবাসীর পক্ষ থেকে উনাকে দেয়া 'আল-আমিন' উপাধির ভাষাতাত্ত্বিক আর ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করলাম। ঠিক?

—ঠিক।

—দেখো, সেই একই গুণ, একই শক্তিশালী বিশেষণধারী অনুপম আর কোমল চরিত্রের মানুষটার সাথে তার সমাজ কেমন আচরণ করেছিল। এই বিচিত্র আর অদ্ভুত অভিজ্ঞতাপ্রাপ্তির পর তিনি যখন নিজেকে এক স্রষ্টার নির্বাচিত বার্তাবাহক হিসেবে ঘোষণা দিলেন, উপাস্যের জায়গায় কেবল এক স্রষ্টাকে স্থান দিয়ে বাদবাকি সবকিছু মিথ্যা আর উপাসনার অযোগ্য বলে জানিয়ে দিলেন, তখন কিন্তু সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল, শুরু করল চরম বিরোধিতা। এটা কি স্ববিরোধী না?

—কখনোই না। তোমার কাছ থেকে এত অগভীর মন্তব্য পেয়ে অবাকই হয়েছি আসলে। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো, সত্যটা তোমার তেতো লাগায়, মনমতো না হওয়ায় তুমি যদি মানতে না চাও, সেটা একান্তই তোমার নিজস্ব চারিত্রিক সমস্যা। সত্যবাদী আর তার বলা সত্য কথা তাতে কি মিথ্যা হয়ে যায়? কক্ষনো নয়।

দেখো, সবাই নিজের ইচ্ছা আর ইন্দ্রিয়পূজার বিরুদ্ধে গিয়ে সত্যকে মেনে নেয় না, নেয়নি, নিবে না। তুমিও সেই দলের যেন না হও সেজন্যেই আলোচনার শুরুতে